সূরা আত তাওবাঃ রুকুঃ ১৩তম আয়াত সংখ্যাঃ (১০০-১১০)

Sisters'Forum In Islam.com

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ৯ : ১০০

১০০. আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তিনি তাদের জন্য তৈরী করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এ তো মহাসাফল্য।

এই আয়াতে তিন শ্রেণীর লোকের বর্ণনা বিদ্যমান।

প্রথমঃ মুহাজিরগণ, যাঁরা দ্বীনের খাতিরে আল্লাহ ও রসূলের আদেশ পালনার্থে মক্কা ও অন্যান্য এলাকা থেকে হিজরত করতঃ সকল কিছু ত্যাগ করে মদীনায় চলে যান।

দ্বিতীয়ঃ আনসারগণ, এরা মদীনার অধিবাসী ছিলেন। এরা সর্বাবস্থায় রসূল (সাঃ)-এর সাহায্য ও সুরক্ষা বিধান করেছিলেন এবং মদীনায় আগত মুহাজিরদের যথাযথ সম্মান করেছিলেন এবং নিজেদের সবকিছু তাদের খিদমতে কুরবান করে দিয়েছিলেন। এখানে সেই উভয় শ্রেণীর 'আস্-সাবিক্বূনাল আওয়ালূন' (অগ্রবর্তী ও প্রথম) ব্যক্তিবর্গের কথা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ সেই উভয় শ্রেণীর মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তি যাঁরা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। এরা কারা ছিলেন তা নির্ধারণ করণে মতবিরোধ রয়েছে।

অনেকের নিকট 'আস্-সাবিক্বূনাল আওয়ালূন' তাঁরা, যাঁরা উভয় ক্বিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। অর্থাৎ ক্বিবলা পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে যে সমস্ত মুহাজির ও আনস্বারগণ মুসলমান হয়েছিলেন তাঁরা।

আবার অনেকের নিকট 'আস্-সাবিক্বূনাল আওয়ালূন' ঐ সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম, যাঁরা হুদাইবিয়ায় অনুষ্ঠিত বাইআতে-রিযওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আবার অনেকের নিকট ওঁরা হলেন তাঁরা, যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইমাম শওকানী (রহঃ) বলেন, সকল অভিমতই সঠিক হতে পারে। তবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হচ্ছে যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির আগে যারা হিজরত করেছে তারা সবাই সাবেকীনে আওয়ালীন। [ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ: ১/১৫৪-১৫৫]

তৃতীয়ঃ- ঐ সকল ব্যক্তি, যাঁরা একনিষ্ঠভাবে সেই মুহাজির ও আনস্বারদের অনুগামী ছিলেন। কেউ কেউ বলেন,তাঁরা হলেন পারিভাষিক অর্থে তাবেয়ীগণ, যাঁরা নবী (সাঃ)-এর দর্শন লাভ করতে পারেননি, কিন্তু সাহাবায়ে কিরামগণের সাথী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। আবার কেউ কেউ তা সাধারণ রেখেছেন, অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত যে সকল মুসলিম মুহাজির ও আনস্বারদের সাথে মহব্বত রাখবেন ও তাঁদের আদর্শের উপর চলবেন, তাঁরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এতে পারিভাষিক অর্থে তাবেয়ীগণও এসে যাচ্ছেন।

- সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত। যদি দুনিয়াতে তাদের কারো দ্বারা কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েও থাকে তবুও। এর প্রমাণ হলো কুরআন করীমের এ আয়াত। এতে শর্তহীনভাবে সমস্ত সাহাবা সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) অবশ্য তাবেয়ীনদের ব্যাপারে বলেছেনঃ (وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ) "যারা সুন্দরভাবে তাদের অনুসরণ করেছে" । সুতরাং তাবেয়ীনদের ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের পরিপূর্ণ সুন্দর অনুসরণের শর্ত আরোপ করা

হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের সবাই কোন রকম শর্তাশর্ত ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিধন্য। এ ব্যাপারে আরও প্রমাণ হলো, আল্লাহ্ তা' আলার (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) অবশ্য আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন মুমিনদের থেকে, যখন তারা গাছের নীচে আপনার হাতে বাই' আত হচ্ছিল" । [সূরা আল-ফাতহঃ ১৮]।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা সূরা মুজাদালাহর ২২ নং আয়াতেও সাহাবাদের প্রশংসা করে তাদের উপর সন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করেছেন---

"আপনি পাবেননা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমানদার এমন কোন সম্প্রদায়, যারা ভালবাসে তাদেরকে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে–হোক না এ বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্ব, ভাই অথবা এদের জ্ঞাতি-গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ লিখে দিয়েছেন ঈমান এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা। আর তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম"।

এছাড়াও সাহাবায়ে কেরামের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে আরো স্পষ্ট দলীলের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ্র বাণীঃ
(لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ)
মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধনপ্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; তাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ 'হুসনা' বা সবচেয়ে ভাল পরিণামের ওয়াদা করেছেন। সূরা নিসাঃ ৯৫।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র আরো বলেনঃ
(لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ)
তোমাদের মধ্যে যারা ফাতহ তথা হুদায়বিয়ার সন্ধির আগে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ওদের চেয়ে, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। [সূরা আল-হাদীদঃ ১০]। এতে বিস্তারিত এভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম প্রাথমিক পর্যায়ের হোন কিংবা পরবর্তী পর্যায়ের, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সবার জন্যই জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট' বাক্যটির অর্থ হল, আল্লাহ তাআলা তাঁদের সৎকর্ম গ্রহণ করেছেন, মানুষ হিসাবে তাঁদের কৃত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তিনি তাঁদের উপর অসন্তুষ্ট নন। যদি তা না হত, তাহলে উক্ত আয়াতে তাঁদের জন্য জান্নাত ও জান্নাতের নিয়ামতের সুসংবাদ দেওয়া হল কেন? এই আয়াত দ্বারা এটাও জানা গেল যে, আল্লাহর এই সন্তুষ্টি সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী নয়, বরং চিরস্থায়ী। যদি রসূল (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর সাহাবায়ে কিরামগণের মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত (যেমন এক বাতিল ফির্কার বিশ্বাস আছে), তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন না। এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, যখন আল্লাহ তাআলা তাঁদের সমস্ত ত্রুটি মার্জনা করে দিয়েছেন, তখন তাঁদের সমালোচনা করে তাঁদের ভুল-ত্রুটি বর্ণনা করা কোন মুসলিমের উচিত নয়। বস্তুতঃ এটাও জানা গেল যে, তাঁদের প্রতি মহব্বত রাখা এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কারণ। আর তাঁদের প্রতি শত্রুতা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করা আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ।

{فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} কাজেই যদি তোমরা জান তবে বল, দু' দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তা লাভের বেশী হকদার। আনয়ামঃ ৮১

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَٰفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم ٩ : ١٥١
مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ

১০১. আর মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশপাশে আছে তাদের কেউ কেউ মুনাফেক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ, তারা মুনাফেকীতে চরমে পৌছে গেছে। আপনি তাদেরকে জানেন না; আমরা তাদেরকে জানি। অচিরেই আমরা তাদেরকে দু' বার শাস্তি দেব তারপর তাদেরকে মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

আয়াতে তৎকালীন মুনাফিকদের দুটি দলের কথা বলা হয়েছে:

· মরুবাসী মুনাফিক: মদীনার আশেপাশের বেদুইন বা আরবী মরুবাসীদের একটি দল, যারা সাময়িক সুবিধা বা ভয়ের কারণে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু অন্তরে কুফরি ধরে রেখেছিল।

· মদীনার মুনাফিক: মদীনার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে একটি দল, যারা মুনাফিকিতে অত্যন্ত দক্ষ ও পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। আয়াতে ব্যবহৃত আরবী শব্দ 'মারাদু' (مَرَدُوا)-এর অর্থ হলো কোনো কাজে অত্যন্ত দক্ষ, অনড় বা অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ, তারা তাদের কপটতা ও চাতুর্যকে এমন চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে বাহ্যিকভাবে তাদের চেনা অসম্ভব ছিল।

مَرَدَ এবং تَمَرَّد এর অর্থ হল নরম, মোলায়েম এবং খালি। সুতরাং পাতা নেই এমন ডালকে, দেহে লোম নেই এমন ঘোড়াকে এবং মুখমন্ডলে এখনো দাঁড়ি-মোছ গজায়নি এমন বালককে أَمْرَدُ বলা হয়। যেমন কাঁচকে صَرْحٌ مُمَرَّدٌ অর্থাৎ مُجَرَّدٌ (স্বচ্ছ) বলা হয়। (مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ) এর অর্থ হবে 'تَجَرَّدُوا عَلَى النِّفَاقِ' অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে মুনাফিকির জন্য খালি করে নিয়েছে, অর্থাৎ, খাঁটি মুনাফিকিতে তারা অনড়।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, "আর আমরা ইচ্ছে করলে আপনাকে তাদের পরিচয় দিতাম; ফলে আপনি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন। তবে আপনি অবশ্যই কথার ভংগিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন [সূরা মুহাম্মাদ: ৩০] এবং বিভিন্ন হাদীসে যে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ১৪ বা ১৫ জনের নাম জানিয়ে দিয়েছেন সেটার সাথে এ আয়াতের কোন দ্বন্ধ নেই। কারণ, সূরা মুহাম্মাদের আয়াতে তাদের চিহ্ন বলে দেয়া উদ্দেশ্য, সবাইকে জানা নয়। অনুরূপভাবে হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যাদের নাম জানিয়েছেন তা দ্বারাও এটা সাব্যস্ত হচ্ছে না যে, তিনি সবার নাম ও পরিচয় পূর্ণভাবে জানতেন। [ইবন কাসীর]

নিজেদের মুনাফিকী গোপন করার ব্যাপারে তারা এতই দক্ষতা অর্জন করেছে যে, নবী (সা.) নিজেও তাঁর অসাধারণ অন্তরদৃষ্টি, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা সত্ত্বেও তাদেরকে চিনতে পারতেন না। এখানে কত পরিষ্কার বাক্যে নবী (সাঃ)-এর 'আ-লিমুল গায়ব' না হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ যতটুকু জানাতেন, তিনি ঠিক ততটুকুই জানতেন। আফসোস! যদি বিদআতীরা কুরআন বুঝার তাওফীক পেত।

· মদীনার মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মজলিসে বসত, মুসলমানদের মতো নামাজ পড়ত এবং জিহাদে অংশ নেওয়ার ভান করত।

· তারা এত নিখুঁতভাবে অভিনয় করত যে, মানুষের পক্ষে তাদের অন্তরের কুফরি ধরা সম্ভব ছিল না।

· তাই আল্লাহ বলেন, হে নবী! আপনি (মানুষ হিসেবে) তাদের আসল রূপ জানেন না, কিন্তু আমি (অন্তর্যামী হিসেবে) তাদের খুব ভালো করেই জানি। (পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তাঁর ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এবং তাঁর বিশ্বস্ত সাহাবী হযরত হুযায়ফা (রা.)-কে মুনাফিকদের একটি গোপন তালিকা জানিয়েছিলেন)।

তাফসীরবিদদের (যেমন: ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও ইবনে কাসীর) মতে, দুনিয়াতে মুনাফিকদের যে 'দুই বার শাস্তি' দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে:

· প্রথম শাস্তি: দুনিয়াতে তাদের গোপন চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়া, মুসলমানদের বিজয়ের কারণে তাদের মনে ক্ষোভ ও হিংসার আগুন জ্বলা, এবং যাকাত বা আর্থিক জরিমানা দিতে বাধ্য হওয়া।

· দ্বিতীয় শাস্তি: মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের দ্বারা কঠিন প্রহার এবং কবরের ভয়াবহ আজাব।

আবার কেউ কেউ বলেছেন দ্বিগুণ শাস্তি মানে হচ্ছে, একদিকে যে দুনিয়ার প্রেমে মত্ত হয়ে তারা ঈমান ও আন্তরিকতার পরিবর্তে মুনাফিকী, ভণ্ডামী ও বিশ্বাসঘাতকতার নীতি অবলম্বন করেছে তা তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং তারা ধন-সম্পদ, মর্যাদাও প্রতিপত্তি লাভের পরিবর্তে বরং শোচনীয় অমর্যাদা, লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতার শিকার হবে। অন্যদিকে তারা যে সত্যের দাওয়াতকে ব্যর্থ ও অসফল দেখতে এবং নিজেদের চালবাজীর মাধ্যমে নস্যাৎ করে দিতে চায় তা তাদের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাদের চোখের সামনে উন্নতি ও বিকাশ লাভ করতে থাকবে।

"অতঃপর তারা ফিরে যাবে মহাশাস্তির দিকে"

এটি হলো তাদের চূড়ান্ত পরিণতি। দুনিয়া এবং কবরের শাস্তির পর, কিয়ামতের দিন তাদেরকে জাহান্নামের সবচেয়ে কঠিন স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। কুরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।" (সূরা আন-নিসা: ১৪৫)।

وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَـٰلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ৯ : ১০২

১০২.আর অপর কিছু লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা এক সৎকাজের সাথে অন্য অসৎকাজ মিশিয়ে ফেলেছে: আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এরা সেই সকল একনিষ্ঠ মুসলিম, যারা কোন ওজর আপত্তি ছাড়াই শুধু শৈথিল্যের কারণে তাবুক অভিযানে নবী (সাঃ)-এর সাথে শরীক হয়নি। তবে পরে তারা আপন ভুল বুঝতে পারে এবং তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করে নেয়।

যে দশজন মুমিন বিনা ওযরে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত ছিলেন তাঁদের সাত জন মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেদের বেঁধে নিয়ে মনের অনুতাপ অনুশোচনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এদের উল্লেখ রয়েছে এ আয়াতে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, দশজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। এদের মধ্যে সাতজন নিজেদেরকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে এসে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা, যারা নিজেদেরকে খুঁটির সাথে বেঁধেছে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, এরা আবু লুবাবা ও তার কিছু সাথী। যারা আপনার সাথে যাওয়া থেকে পিছনে ছিল। তারা নিজেদেরকে নিজেরা বেঁধে নিয়েছে এ বলে যে, যে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে আমাদের বাঁধন খুলে দিবেন এবং আমাদের ওযর কবুল করবেন, ততক্ষণ আমাদেরকে যেন কেউ না খুলে দেয়।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমিও তাদের বাঁধন খুলব না, তাদের ওযর গ্রহণ করবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ নিজেই তাদের ছেড়ে দেন বা ওযর গ্রহণ করেন। তারা আমার থেকে বিমুখ ছিল, মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে যায়নি। যখন তাদের কাছে এ কথা পৌছল তারাও বলল, আমরাও আল্লাহর শপথ নিজেদেরকে ছাড়িয়ে নেব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের ছাড়ানোর ব্যবস্থা না করেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে নেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

ঘটনা যদিও সুনির্দিষ্ট তথাপি এর দাবী ব্যাপক। যারাই ভাল ও মন্দ আমলের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে তাদের ক্ষেত্রেই এ আয়াত প্রযোজ্য। যেমন হাদীসে এসেছে, সামুরা ইবন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, গত রাত্রে আমার কাছে দুজন এসেছেন, তারা আমাকে উঠালেন, তারপর আমাকে নিয়ে এমন এক নগরীতে নিয়ে গেলেন যার একটি ইট স্বর্ণের অপরটি রৌপ্যের। সেখানে আমরা কিছু লোক দেখলাম, যাদের শরীরের একাংশ এত সুন্দর যত সুন্দর তুমি মনে করতে পার। আর অপর অংশ এত বিশ্রী যত বিশ্রী তুমি মনে করতে পার। তারা দু'জন তাদেরকে বলল, তোমরা ঐ নালাতে গিয়ে পতিত হও। তারা সেখানে পড়ল। তারপর যখন তারা আমাদের কাছে আসল, দেখলাম যে, তাদের খারাপ অংশ চলে গেছে, অতঃপর ভীষণ সুন্দর হয়ে গেছে। তারা দু'জন আমাকে বলল, এটা হলো জান্নাতে আদন। আর

ওখানেই আপনার স্থান। তারা দু’ জন বলল, আর যাদেরকে আপনি অর্ধেক সুন্দর আর বাকী অর্ধেক বিশ্রী দেখেছেন, তারা হচ্ছেন, যারা এক সৎকাজের সাথে অন্য অসৎকাজ মিশিয়ে ফেলেছে। [বুখারী ৪৬৭৪]

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ৯ : ১০৩

১০৩. আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন। আর আপনি তাদের জন্য দো’আ করুন। আপনার দোআ তো তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

মুফাসসিরগণ এ সাদকার প্রকৃতি নির্ধারণ নিয়ে দুটি মত দিয়েছেন। কারও কারও মতে, এ আয়াতে পূর্ববর্তী আয়াতে যাদের তাওবাহ কবুল করা হয়েছে তাদের সদকা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। সেটা ফরয বা নফল যে কোন সদকা হতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] এ মতের সমর্থনে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন পূর্বোক্ত লোকদের তাওবা কবুল করা হয়, তখন তারা তাদের সম্পদ নিয়ে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো আমাদের সম্পদ, এগুলো গ্রহণ করে আমাদের পক্ষ থেকে সদকা দিন এবং আমাদের জন্য ক্ষমার দো’আ করুন। তিনি বললেন, আমাকে এর নির্দেশ দেয়া হয়নি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [আত-তাফসীরুস সহীহ] তবে অধিকাংশের মতে, নির্দেশটি ব্যাপক, সবার জন্যই প্রযোজ্য। তবে সেটা ফরয সদকা বা যাকাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। [ফাতহুল কাদীর] এ মতের সমর্থনে বেশ কিছু হাদীস রয়েছে, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাত প্রদানকারীদের জন্য দোআ করেছেন।

() রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নির্দেশ মোতাবেক সাহাবীদের মধ্যে কেউ যাকাত নিয়ে আসলে তাদের পরিবারের জন্য দো’আ করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা যাকাত নিয়ে আসলে তিনি বলতেন, ‘আল্লাহুম্মা সাল্লে ‘আলা আলে ফুলান’ । (হে আল্লাহ! অমুকের বংশধরের জন্য সালাত প্রেরণ করুন) অতঃপর আমার পিতা তার কাছে যাকাত নিয়ে আসলে তিনি দো’আ করলেন, “আল্লাহুম্মা সাল্লে ’আলা আলে আবি আওফা” । হে আল্লাহ! আবু আওফার বংশধরের জন্য সালাত প্রেরণ করুন। [বুখারী: ১৪৯৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার ও আমার স্বামীর জন্য দোআ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘সাল্লাল্লাহু আলাইকে ওয়া ’আলা যাওজিকে’ (আল্লাহ তোমার ও তোমার স্বামীর জন্য সালাত প্রেরণ করুন)। [আবু দাউদ: ১৫৩৩]

সাদাকার অনেক ফায়দা রয়েছে তার মাঝে অন্যতম--

গুনাহ মাফ ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যম হিসেবে সদকা:

"যদি তোমরা প্রকাশ্যে সদকা দাও, তবে তা কতই না উত্তম; আর যদি তা গোপনে দাও এবং অভাবগ্রস্তদের দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও বেশি কল্যাণকর এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের কিছু গুনাহ মোচন করবেন।" — [সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৭১]

সদকা গুনাহ ও পাপ মিটিয়ে দেয়:

রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)-কে বলেছিলেন:"...সদকা বা দান গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয় (নিভিয়ে দেয়), যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।" — [জামে আত-তিরমিযী, হাদীস নং ২৬১৬; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৭৩]

সম্পদ পবিত্র ও বৃদ্ধির মাধ্যম যাকাত:"তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, মানুষের সম্পদে তা বৃদ্ধি পাবে বলে, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাকো, তারাই মূলত তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করে।" — [সূরা আর-রূম, ৩০:৩৯]

দানকারীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ:"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" [সূরা আল-বাকারাহ:২৭৪]

দান করলে সম্পদ কমে না, বরং আত্মিক মর্যাদা বাড়ে:

রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন:"সদকা বা দান করার কারণে কখনো কোনো সম্পদ কমে না। আর বান্দার ক্ষমার বিনিময়ে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই করেন না। কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনীত হলে, আল্লাহ তাকে উচ্চাসনে আসীন করেন।" — [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৮৮]

তাবুক যুদ্ধ থেকে পেছনে রয়ে যাওয়া প্রখ্যাত সাহাবী হযরত কাব ইবনে মালিক (রা.)-এর তাওবাহ যখন কবুল হয়, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলেছিলেন:"হে আল্লাহর রাসূল! আমার তাওবাহ কবুল হওয়ার শুকরিয়া হিসেবে আমি আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য সদকা করে দিতে চাই।" তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "তুমি তোমার সম্পদের কিছু অংশ নিজের কাছে রেখে দাও, সেটাই তোমার জন্য উত্তম।" — [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৫৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬৯]

أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ৯ : ১০৪

১০৪. তারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ তার বান্দাদের তাওবাহ কবুল করেন এবং ‘সদকা’ গ্রহণ করেন, আর নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

তিনিই দান-খয়রাত বা স্বাদাক্বাহ গ্রহণ করেন’ (এই শর্তের উপর যে তা হালাল উপার্জন থেকে হতে হবে) এর অর্থ হল তা বৃদ্ধি করেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; নবী (সাঃ) বলেছেন ‘‘যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে -- আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না -- সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন; যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করে থাকে। পরিশেষে তা পাহাড়ের মত হয়ে যায়।’ (বুখারী: ১৪১০নং, মুসলিম: ১০১৪নং)

وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ৯ : ১০৫

১০৫. আর বলুন, তোমরা কাজ করতে থাক, আল্লাহ তো তোমাদের কাজকর্ম দেখবেন এবং তার রাসূল ও মুমিনগণও। আর অচিরেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানীর নিকট, অতঃপর তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।

এখানে মিথ্যা ঈমানের দাবীদার ও গোনাহগার মু’মিনের পার্থক্য, পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

যে ব্যক্তি ঈমানের দাবী করে, কিন্তু আসলে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিদের জামায়াতের ব্যাপারে আন্তরিক নয়, তার এ আন্তরিকতাহীনতার প্রমাণ যদি তার কার্যকলাপের মাধ্যমে পাওয়া যায়, তাহলে তার সাথে কঠোর ব্যবহার করা হবে। আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য সে কোন সম্পদ পেশ করলে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। সে মারা গেলে কোন মুসলমান তার জানাযার নামায পড়বে না এবং তার গোনাহ মাফের জন্য দোয়াও করবে না, সে তার বাপ বা ভাই হলেও।

অন্যদিকে যে ব্যক্তি সত্যিকার মু’মিন কিন্তু এ সত্ত্বেও সে এমন কিছু কাজ করে বসেছে যা তার আন্তরিকাতাহীনতার প্রমাণ করে, এক্ষেত্রে সে যদি নিজের ভুল স্বীকার করে নেয় তাহলে তাকে মাফ করে দেয়া হবে। তার সদকা, দান-খয়রাত গ্রহণ করা হবে এবং তার ওপর রহমত নাযিলের জন্য দোয়াও করা হবে। এখন কোন ব্যক্তির আন্তরিকতাবিহীন কার্যকলাপের পরও তাকে নিছক একজন গোনাহগার মু’মিন গণ্য করতে হলে তাকে তিনটি মানদণ্ডে যাচাই করতে হবে। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত এ মানদণ্ডগুলোর নিম্নরূপঃ

(১) নিজের ভুলের জন্য সে খোঁড়া অজুহাত ও মনগড়া ব্যাখ্যা পেশ করবে না। বরং যে ভুল হয়ে গেছে সহজ সরলভাবে তা মেনে নেবে।

(২) তার আগের কার্যকলাপ দেখা হবে। সে আন্তরিকতাহীনতার দাগী ও অপরাধী কিনা তা যাচাই করা হবে। যদি আগে সে ইসলামের জামায়াতের এক সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে এবং তার জীবনের সমস্ত কার্যকলাপে আন্তরিক সেবা, ত্যাগ, কুরবানী ও ভালো কাজে অগ্রবর্তী থাকার রেকর্ড থেকে থাকে, তাহলে ধরে নেয়া হবে যে, বর্তমানে যে ভুল সে করেছে তা ঈমান ও আন্তরিকতাহীনতার ফল নয় বরং তা নিছক সাময়িক সৃষ্ট একটি দুর্বলতা বা পদস্খলন ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৩) তার ভবিষ্যত কার্যকলাপের ওপর নজর রাখা হবে। দেখতে হবে, তার ভুলের স্বীকৃতি কি নিছক মৌখিক, না তার মধ্যে লজ্জার গভীর অনুভূতি রয়েছে। যদি নিজের ভুল সংশোধনের জন্য তাকে অস্থির ও উৎকণ্ঠিত দেখা যায় এবং তার প্রতিটি কথা থেকে এ কথা প্রকাশ হয় যে, তার জীবনে যে ঈমানী ত্রুটির চিত্র ভেসে উঠেছিল তাকে মুছে ফেলার ও তা সংশোধন করার জন্য সে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তাহলে সে যথার্থই লজ্জিত হয়েছে বলে মনে করা হবে। এ লজ্জা ও অনুশোচনাই হবে তার ঈমান ও আন্তরিকতার প্রমাণ।

মুহাদ্দিসগণ এ আয়াতগুলো নাযিলের পটভূমী হিসেবে যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা থেকে এ বিষয়বস্তুটি আয়নার মতো স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। তাঁরা বলেন, এ আয়াতগুলো আবু লুবাবাহ ইবনে আবদুল মুনযির ও তাঁর ছ'জন সাথীর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। হিজরতের আগে আকাবার বাইআতের সময় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আবু লুবাবাহ ছিলেন তাদের একজন। বদর, ওহোদ ও অন্যান্য যুদ্ধে তিনি বরাবর অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাবুক যুদ্ধের সময় মানসিক দুর্বলতার তার ওপর প্রধান্য বিস্তার করে এবং কোন প্রকার শরয়ী ওযর ছাড়াই তিনি ঘরে বসে থাকেন। তার অন্য সাথীরাও ছিলেন তারই মতো আন্তরিকতা সম্পন্ন। তারাও এ একই প্রকার দুর্বলতার শিকার হন। নবী (সা.) যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন এবং যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মতামত কি তা তারা জানতে পারলেন তখন তারা ভীষণভাবে অনুতপ্ত হলেন। কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদের আগেই তারা নিজেদেরকে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে নেন এবং বলেন, আমাদের মাফ না করে দেয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য আহার নিদ্রা হারাম। এ অবস্থায় আমাদের প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেলেও আমরা তার পরোয়া করবো না। কয়েক দিন পর্যন্ত এভাবেই তারা বাঁধা অবস্থায় অনাহার অনিদ্রায় কাটান। এমনকি একদিন তারা বেহুশ হয়ে পড়ে যান। শেষে তাদের জানানো হলো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন। তারা নবী (সা.) কে বলেন, ঘরের যে আরাম আয়েশ আমাদের ফরয থেকে গাফেল করে দিয়েছিল তা এবং নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ আমরা আল্লাহর পথে দান করে দেবো, এটাও আমাদের তাওবার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নবী (সা.) বলেন, সমস্ত ধন-সম্পদ দান করে দেবার দরকার নেই, শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। তদনুসারে তখনই তারা সেগুলো আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দেন। এ ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার জানা যায়, কোন ধরনের দুর্বলতা আল্লাহ মাফ করেন। উল্লিখিত মহান সাহাবীগণ এ ধরনের আন্তরিকতাহীন আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন না। বরং তাদের বিগত জীবনের কার্যকলাপ তাদের ঈমানী নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ ছিল। এবারেও রসূল ﷺ এর নিকট তাদের কেউ মিথ্যা অজুহাত পেশ করেননি। বরং নিজেদের ভুলকে নিজেরাই অকপটে ভুল হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তাঁরা ভুলের স্বীকারোক্তি সহকারে নিজেদের কার্য ধারার মাধ্যমে একথা প্রমাণ করে দিয়েছের যে, তারা যথার্থই লজ্জিত হয়েছেন এবং নিজেদের গোনাহ মাফ করাবার জন্য অত্যন্ত অস্থির ও উদ্বিগ্ন।

এখানে আলোচ্য আয়াতটিতে আর একটি মূল্যবান কথা বলা হয়েছে। সে কথাটি হচ্ছে, গোনাহ মাফের জন্য মুখ ও অন্তর দিয়ে তাওবা করার সাথে সাথে বাস্তব কাজের মাধ্যমেও তাওবা করতে হবে। আর আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ দান করা হচ্ছে বাস্তব তাওবার একটি পদ্ধতি। এভাবে নফসের মধ্যে যে দূষিত ময়লা আবর্জনা লালিত হচ্ছিল এবং যার কারণে মানুষ গোনাহে লিপ্ত হয়েছিল তা দূর হয়ে যায় এবং ভালো ও কল্যাণের দিকে ফিরে যাবার যোগ্যতা বেড়ে যায়। গোনাহ করার পর তা স্বীকার করার ব্যাপারটি এমন যেমন এক ব্যক্তি গর্তের মধ্যে পড়ে যায় এবং নিজের পড়ে যাওয়াটা সে অনুভব করতে পারে। তারপর নিজের গোনাহের ওপর তার লজ্জিত হওয়াটা এ অর্থ বহন করে যে, এ গর্তকে সে নিজের অবস্থানের জন্য বড়ই খারাপ জায়গা মনে করে

--- চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিটি বিষয় সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। আর আল্লাহ এমন এক সত্তা যার কাছে কোন কিছু গোপন থাকতে পারে না। এ জন্য কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় তার ভন্ডামী ও মুনাফিকী গোপন করতে সক্ষমও হয় এবং মানুষ যেসব

মানদণ্ডে কারোর ঈমান ও আন্তরিকতা পরখ করতে পারে সেসবগুলোতে পুরোপুরি উত্তির্ণ হলেও একথা মনে করা উচিত নয় যে, সে মুনাফিকীর শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে গেছে।

وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ৯ : ১০৬

১০৬. আর আল্লাহর আদেশের প্রতীক্ষায় অপর কিছু সংখ্যক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেয়া হল–তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন, না ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

এখানে পূর্বোল্লেখিত দশ জন সাহাবী যারা তাবুকের যুদ্ধে অংশ নেয়নি এবং মসজিদের স্তম্ভের সাথে নিজেদের বেঁধে নেয়নি এমন বাকী তিন জনের হুকুম রয়েছে। এ আয়াত নাযিল করে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল। এক বছর পর্যন্ত তাদের এ অবস্থা ছিল। তাদেরকে কি শাস্তি দেয়া হবে, নাকি তাদের তাওবা কবুল করা হবে তা তারা জানে না। [আত-তাফসীরুস সহীহ] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সমাজচ্যুত করার, এমনকি তাঁদের সাথে সালাম-দোয়ার আদান প্রদান পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এ ব্যবস্থা নেয়ার পর তাদের অবস্থা শোধরে যায় এবং তারা এখলাসের সাথে অপরাধ স্বীকার করে তাওবাহ করে নেন। ফলে তাদের জন্য ক্ষমার আদেশ দেয়া হয়। যার আলোচনা অচিরেই আসবে।

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًۢا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ৯ : ১০৭

১০৭. আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন, কুফর ও মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এর আগে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছে তার গোপন ঘাঁটিস্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে, আমরা কেবল ভালো চেয়েছি; আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী।

মদীনায় আবু আমের নামের এক ব্যক্তি জাহেলী যুগে নাসারা ধর্ম গ্রহণ করে আবু 'আমের পাদ্রী নামে খ্যাত হলো। তার পুত্র ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহু যার লাশকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতা নিজের গোমরাহী ও নাসারাদের দ্বীনের উপরই ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হলে আবু আমের তার কাছে উপস্থিত হয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিযোগের জবাব দান করেন। কিন্তু তাতে সেই হতভাগার সান্তনা আসলো না।

তদুপরি সে বলল, আমরা দু'জনের মধ্যে যে মিথুক সে যেন অভিশপ্ত ও আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে। সে একথাও বলল যে, আপনার যে কোন প্রতিপক্ষের সাহায্য আমি করে যাবো। সে মতে হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত সকল রণাঙ্গনে সে মুসলিমদের বিপরীতে অংশ নেয়। হাওয়াযেনের মত সুবৃহৎ শক্তিশালী গোত্রও যখন মুসলিমদের কাছে পরাজিত হলো, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়ায় চলে গেল। [বাগভী] কারণ, তখন এটি ছিল নাসারাদের কেন্দ্রস্থল।

এ ষড়যন্ত্রের শুরুতে সে মদীনার পরিচিত মুনাফিকদের কাছে চিঠি লিখে যে, "রোম সম্রাট কর্তৃক মদীনা অভিযানের চেষ্টায় আমি আছি। কিন্তু যথা সময় সম্রাটের সাহায্য হয় এমন কোন সম্মিলিত শক্তি তোমাদের থাকা চাই। এর পন্থা হলো এই যে, তোমরা মদীনায় মসজিদের নাম দিয়ে একটি গৃহ নিমৰাণ কর, যেন মুসলিমদের অন্তরে কোন সন্দেহ না আসে। তারপর সে গৃহে নিজেদের সংগঠিত কর এবং যতটুকু সম্ভব যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সেখানে রাখ এবং পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের পর মুসলিমদের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা গ্রহণ কর। তারপর আমি রোম সম্রাটকে নিয়ে এসে মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের উৎখাত করব।" [তাবারী]

তার এ পত্রের ভিত্তিতে বার জন মুনাফিক মদীনার কুবা মহল্লায়, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন- সেখানে সে মুনাফিকরা আরেকটি মসজিদের ভিত্তি রাখল। [ইবন হিশাম, কুরতুবী; ইবন কাসীর প্রমুখ ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরগণ এ বার জনের নাম উল্লেখ করেছেন] তারপর তারা মুসলিমদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত নিল যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা এক ওয়াক্ত সালাত সেখানে পড়াবে।

এতে মুসলিমগণ নিশ্চিত হবে যে, পুর্বনির্মিত মসজিদের মত এটিও একটি মসজিদ। এ সিদ্ধান্ত মতে তাদের এক প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করে যে, কুবার বর্তমান মসজিদটি অনেক ব্যবধানে রয়েছে। দূর্বল ও অসুস্থ লোকদের সে পর্যন্ত যাওয়া দুষ্কর। এছাড়া মসজিদটি এমন প্রশস্তও নয় যে, এলাকার সকল লোকের সংকুলান হতে পারে। তাই আমরা দুর্বল লোকদের সুবিধার্থে অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি যদি তাতে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন, তবে আমরা ধন্য হব। [বাগভী; ইবন কাসীর]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এখন সফরের প্রস্তুতিতে আছি। ফিরে এসে সালাত আদায় করব। কিন্তু তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যখন তিনি মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন মসজিদে দ্বিরার সম্পর্কিত এই আয়াতগুলো নাযিল হয়। এতে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়া হল। আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় সাহাবীকে এ হুকুম দিয়ে পাঠালেন যে, এক্ষুণি গিয়ে কথিত মসজিদটি ধ্বংস কর এবং আগুন লাগিয়ে এসো। আদেশমতে তারা গিয়ে মসজিদটি সমুলে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আসলেন। [বাগভী; সীরাতে ইবন হিশাম; ইবন কাসীর]

() এখানে এ মাসজিদ নির্মাণের মোট চারটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথমতঃ মুসলিমদের ক্ষতিসাধন। দ্বিতীয়তঃ কুফরী করার জন্য, তৃতীয়তঃ মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করা। চতুর্থতঃ সেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের আশ্রয় মিলবে যেন আবু আমের আর রাহেব এবং তারা বসে বসে ষড়যন্ত্র পাকাতে পারবে। [মুয়াস্সার]

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ৯ : ১০৮

১০৮. আপনি তাতে কখনো সালাতের জন্য দাঁড়াবেন না; অবশ্যই যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই আল্লাহভীতির উপর স্থাপিত হয়েছে, তাতেই (নামাযের জন্য) দাঁড়ানো তোমার অধিক সমুচিত। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে যারা উত্তমরূপে পবিত্র হওয়াকে পছন্দ করে। আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা সম্পাদনকারীদেরকে পছন্দ

অর্থাৎ, তুমি সেখানে গিয়ে নামায পড়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, সে অনুযায়ী সেখানে গিয়ে নামায পড়বে না। সুতরাং মহানবী (সাঃ) সেখানে নামায তো পড়েননি; বরং কতিপয় সাহাবীকে পাঠিয়ে সেই তথাকথিত মসজিদটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এই কর্ম দ্বারা দলীল নিয়ে উলামাগণ বলেন, যদি কোন মসজিদ আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত, মুসলিমদেরকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়, তবে তাকে 'মসজিদে য়িরার' বলা যাবে এবং তা ভেঙ্গে ধ্বংস করে দিতে হবে। যাতে মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও ভেদাভেদ সৃষ্টি না হয়।

প্রশংসিত সে মসজিদ কোনটি, তা নির্ণয়ে দুটি মত রয়েছে, কোন কোন মুফাসসির আয়াতের বর্ণনাধারা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তা হলো মসজিদে কুবা। [ইবন কাসীর; সা' দী] যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সালাত আদায় করতে আসতেন। [মুসলিম: ১৩৯৯]

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মদীনার উপকণ্ঠে কুবা মসজিদ নির্মাণ করেন, তখন ফেরেশতা জিবরীল (আ.) এই মসজিদের সঠিক দিক বা কেবলা নির্ধারণে সাহায্য করেছিলেন। "যার কেবলা জিবরীল নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন [আবু দাউদ: ৩৩; তিরমিযী: ৩১০০; ইবন মাজাহ: ৩৫৭] যেখানে সালাত আদায় করলে উমরার সওয়াব হবে বলে ঘোষণা করেছেন। [তিরমিযী: ৩২৪; ইবন মাজাহ:

১৪১১] হাদীসের কতিপয় বর্ণনা থেকেও এটিই যে তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্মিত মসজিদ সে কথার সমর্থন পাওয়া যায়। আবার বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এ মসজিদ বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ উল্লেখ করা হয়েছে। [উদাহরণস্বরূপ মুসলিম: ১৩৯৮; মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৩১] বস্তুত: এ দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ উভয় মাসজিদই তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। [কুরতুবী; সাদী]

() এখানে সেই মসজিদকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে অধিকতর হকদার বলে অভিহিত করা হয়, যার ভিত্তি শুরু থেকেই তাকওয়ার উপর রাখা হয়েছে। সে হিসেবে মসজিদে কুবা ও মসজিদে নববী উভয়টিই এ মর্যাদায় অভিষিক্ত। সে মসজিদেরই ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তথাকার মুসল্লীগণ পাক-পবিত্রতা অর্জনে সবিশেষ যত্নবান। পাক-পবিত্রতা বলতে এখানে সাধারণ না-পাকী ও ময়লা থেকে পাক-পরিচ্ছন্ন হওয়া বুঝায়। আর মসজিদে নববীর মুসল্লীগণ সাধারণতঃ এসব গুণেই গুণান্বিত ছিলেন। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুবাবাসীদের বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আল্লাহ পবিত্রতার ব্যাপারে তোমাদের প্রশংসা করেছেন। তোমরা কিভাবে পবিত্র হও? তারা বলল, আমরা সালাতের জন্য অযু করি, জানাবাত থেকে গোসল করি এবং পানি দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করি। [ইবন মাজাহ ৩৫৫]

ইরওয়াউল গালীল ৪২নং দ্রঃ) ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, এই আয়াত এই কথার প্রমাণ যে, এমন পুরাতন মসজিদে নামায আদায় করা উত্তম, যে মসজিদ একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার নিমিত্তে নির্মাণ করা হয়েছে। অনুরূপ নেক লোকদের জামাআতে এবং এমন ব্যক্তিদের সাথে নামায পড়া উত্তম যারা পূর্ণরূপে ওযূ করতে ও পবিত্রতা অর্জনে বিশেষ যত্নবান।

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ ١٠٩ : ٩ فَٱنْهَارَ بِهِۦ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

১০৯. যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি আল্লাহর তাকওয়া ও সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সে উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাদের ধ্বংসোন্মুখ কিনারে, ফলে যা তাকেসহ জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়ে? আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।

এই আয়াতে মু’ মিন ও মুনাফিকদের আমলের উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে। মু’ মিনদের আমল আল্লাহ-ভীতির ভিত্তিতে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে হয়। আর মুনাফিক্বদের আমল লোক প্রদর্শন ও উদ্দেশ্য-ভ্রষ্টতার উপর ভিত্তি করে হয়। যা ভূমির সেই অংশের মত যার তলদেশ দিয়ে উপত্যকার পানি প্রবাহিত হয় এবং সেখানকার মাটিকে নিজের সাথে বয়ে নিয়ে যায়। ফলে সেই অংশের তলদেশ ফাঁকা হয়ে যায়। বিদিত যে, তার উপর কোন ঘর নির্মাণ করলে অতি সত্ত্বর তা ভেঙ্গে পড়বে। সেই মুনাফিকদের মসজিদ নির্মাণের কাজও অনুরূপ, যা তাদের নিয়ে জাহান্নামে পতিত হবে।

এখানে কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে,جرف(জুরুফ)। আরবী ভাষায় সাগর বা নদীর এমন কিনারাকে জুরুফ বলা হয় স্রোতের টানে যার তলা থেকে মাটি সরে গেছে এবং ওপরের অংশ কোন বুনিয়াদ ও নির্ভর ছাড়াই দাঁড়িয়ে আছে। যারা আল্লাহকে ভয় না করা এবং তার সন্তুষ্টির পরোয়া না করার ওপর নিজেদের কার্যক্রমের ভিত গড়ে তোলে, তাদের জীবন গঠনকে এখানে এমন একটি ইমারতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যা এমনি ধরনের একটি অন্তঃসরা শূন্য অস্থিতিশীল সাগর কিনারে নির্মাণ করা হয়েছে। এটি একটি নজিরবিহীন উপমা। এর চাইতে সুন্দরভাবে এ অবস্থার আর কোন চিত্র, আকা সম্ভব নয়। এর সমগ্র অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে বুঝে নিতে হবে যে, দুনিয়ার জীবনের যে উপরিভাগের ওপর মু’ মিন, মুনাফিক কাফের, সৎকর্মশীল, দুষ্কৃতকারী তথা সমস্ত মানুষ কাজ করে, তা মাটির উপরিভাগের স্তরের মতো যার ওপর দুনিয়ার সমস্ত ইমারত নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এ স্তরের মধ্যে কোন স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা নেই। বরং এর নীচে নিরেট জমি বিদ্যমান থাকার ওপরই এর স্থিতিশীলতা নির্ভর করে। যে স্তরের নীচের মাটির কোন জিনিসের যেমন নদীর পানির তোড়ে ভেসে গেছে তার ওপর যদি কোন মানুষ (যে মাটির প্রকৃত অবস্থা জানে না) বাহ্যিক অবস্থায় প্রতারিত হয়ে নিজের গৃহ নির্মাণ করে তাহলে তা তার গৃহসহ ধ্বসে পড়বে এবং সে কেবল নিজেই ধ্বংস হবে না। বরং এ অস্থিতিশীল ভিতের ওপর নির্ভর করে নিজের জীবনের যা কিছু পুঁজিপাট্টা সে সংশ্লিষ্ট গৃহের মধ্যে জমা করেছিল সবই এ সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে। দুনিয়ার জীবনের এ বাহ্যিক স্তরটিরও এ উপমাটির সাথে হুবহু মিল রয়েছে। এ স্তরটির ওপরই আমরা সবাই আমাদের জীবনের যাবতীয় কার্যক্রমের ইমারত নির্মাণ করি। অথচ এর নিজের কোন

স্থিতি ও স্থায়িত্ব নেই। বরং আল্লাহর ভয়তার সামনে জবাবদিহির অনুভূতি এবং তার ইচ্ছা ও মর্জি মতো চলার শক্ত ও নিরেট পাথর খণ্ড তার নীচে বসানো থাকে, এরই ওপর তার মজবুতী ও স্থিতিশীলতা নির্ভর করে। যে অজ্ঞ ও অপরিণামদর্শী মানুষ নিছক দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিকের ওপর ভরসা করে আল্লাহর ভয়ে ভীত না হয়ে এবং তার সন্তোষ লাভের পরোয়া না করে দুনিয়ায় কাজ করে যায় সে আসলে নিজের জীবন গঠনের বুনিয়াদ নীচে থেকেই অন্তঃসার শূন্য করে দেয়। তার শেষ পরিণতি এছাড়া আর কিছুই নয়, যে ভিত্তিহীন যে উপরি স্তরের ওপর সে তার সারা জীবনের সঞ্চয় জমা করেছে। একদিকে অকস্মাৎ তা ধ্বসে পড়বে এবং তাকে তার জীবনের সমস্ত সম্পদসহ ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে।

لَا يَزَالُ بُنْيَـٰنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا۟ رِيبَةً فِى قُلُوبِهِمْ إِلَّآ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ৯ : ১১০

১১০. তাদের ঘর যা তারা নির্মাণ করেছে তা তাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে- যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

অর্থাৎ তারা মুনাফিক সুলভ ধোঁকা ও প্রতারণার বিরাট অপরাধ করে নিজেদের অন্তরকে চিরকালের জন্য ঈমানী যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করেছে। বেঈমানী ও নাফরমানীর রোগ তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুপ্রবেশ করেছে। যতদিন তাদের এ অন্তর থাকবে ততদিন এ রোগ ও সেখানে অবস্থান করবে। আল্লাহর হুকুম অমান্য করার জন্য যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে মন্দির নির্মাণ করে অথবা তার দ্বীনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ব্যারিকেড ও ঘাটি তৈরী করে তার হেদায়াত ও কোন না কোন সময় সম্ভব। কারণ তার মধ্যে স্পষ্টবাদিতা, আন্তরিকতা ও নৈতিক সাহসের সূক্ষ্মতার উপাদান মৌলীক ভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। আর এ উপাদান সত্য ও ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করার জন্য ঠিক তেমনিভাবে কাজে লেগে যেমন মিথ্যা ও অন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করার জন্য কাজে লাগে। কিন্তু যে কাপুরুষ, মিথ্যুক ও প্রতারক আল্লাহর নাফরমাণী ও হুকুম অমান্য করার জন্য মসজিদে নির্মাণ করে এবং আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আল্লাহর প্রশস্তির প্রতারণামূলক পেষাক পরিধান করে, মুনাফিকীর ঘুণে তার চরিত্র কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে। আন্তরিকতার সাথে ঈমানের বোঝা বহন করার ক্ষমতা সে কোথা থেকে পাবে?

অন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়’ এর অর্থ হল, মারা যায়। অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত এই গৃহ তাদের অন্তরে আরো বেশি সন্দেহ ও মুনাফিকী সৃষ্টি করার কারণ হয়ে থাকবে। যেমন বাছুর পূজারীদের হৃদয়-মনে বাছুর-প্রীতি জমে বসেছিল।